চর্যাপদ (S.S)

Brian Hodgson নামে জনৈক ইংরেজ ব্যক্তি সর্বপ্রথম নেপাল থেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বেশ কিছু পুঁথি আবিষ্কার করেন। যার ভিত্তিতে Eugene Burnouf (১৮৪৪) বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী ইতিহাস লেখার কাজে হাত দিয়েছিলেন। হজসনের আবিষ্কারের ফলে নেপালে পুঁথি সংগ্রহের কাজ ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনার কাজে বিশেষজ্ঞদের বিশেষ উৎসাহ দেখা দেয়। এরপর Daniel Wright নামে আরেক ইংরেজ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনেকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন।এরপর অনেকেই এ কাজে এগিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য Cecil Bendall, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

১৮৯৭ সালে Bendall 'সুভাষিত সংগ্রহ' নামে বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটি পুঁথি আনেন। এই গ্রন্থে বাংলা ভাষার আগের রূপ- অবহট্টে লেখা ২৮টি দোহা থেকে গবেষকরা নেপালে 'নতুন ভাষা'-র উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হলেন।১৮৮২ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' নামে একটি রচনাও লিখেছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হয়ে তিনবার নেপালে গিয়েছিলেন। ১৮৯৭-৯৮ সালে দু'বার, ১৯০৭ সালে আরেকবার এবং সেখান থেকে বেশ কয়েকটি নতুন পুঁথি আবিষ্কার করেন:

১৮৯৭-৯৮: ডাকার্ণব, সুভাষিত সংগ্রহ, দোহাকোষ পঞ্জিকা।
১৯০৭: চর্যাচর্যবিনিশ্চয়- পদ সংগ্রহ, সরহপাদের দোহা, অদ্বয়বজ্রের সংস্কৃতে লেখা সহজাম্নায় পঞ্জিকা শীর্ষক টীকা, কৃষ্ণাচার্যের দোহা, আচার্যপাদের সংস্কৃতে লেখা মেখলা নামক টীকা।

প্রাপ্ত পুঁথিগুলিকে তাঁর প্রাচীন বাংলায় লেখা নামে মনে হয়। **চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহপাদের দোহা এবং অদ্বয় বজ্রের সংস্কৃত সহজাম্নায় পঞ্জিকা, কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নপাদের দোহা, আচার্যপাদের সংস্কৃত মেখলা নামক টীকা ও আগেই আবিষ্কৃত ডাকার্ণব পুঁথি একত্রে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (শ্রাবণ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ' হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধগান ও দোঁহা' শিরোনামে সম্পাদকীয় ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মোট ৪৬টি পূর্ণাঙ্গ ও একটি খণ্ডিত পদ পেয়েছিলেন।** পুঁথিটির মধ্যে কয়েকটি পাতা ছেঁড়া ছিল। মূল পুঁথির পদের সংখ্যা ছিল ৫১। মূল তিব্বতি অনুবাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, মূল পুঁথির নাম **চর্যাগীতিকোষ** এবং এতে ১০০টি পদ ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুঁথিটি চর্যাগীতিকোষ থেকে নির্বাচিত পুঁথিসমূহের সমূল টীকাভাষ্য ।

যদিও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেছিলেন সবকটি পুঁথির ভাষাই বাংলা তবে গবেষকরা দেখালেন চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-এর ভাষাই শুধু বাংলা, অন্যগুলি পশ্চিমা অপভ্রংশে লেখা। হরপ্রসাদের ধারণা ছিল মূল পুঁথিটির নাম চর্যাচর্যবিনিশ্চয় কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী জানালেন মূল গীতি সংগ্রহের নাম 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'। গ্রন্থের বিষয় গুহ্য ভাষায় লেখা সহজিয়া বৌদ্ধ সাধনার তত্ত্ব ও পদ্ধতি।

পদকর্তা : চর্যার লেখকরা সিদ্ধাচার্য বা পা বা পাদ নামে পরিচিত।'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এ মোট ২২জন কবির সাড়ে ছচল্লিশটি গান পাওয়া যায়। যেগুলির সাধারণ দৈর্ঘ্য দশ পঙক্তি। তবে তিনটি চোদ্দ পঙক্তির, দুটি বারো পঙক্তির এবং একটি আট পঙক্তিরও গান এতে আছে। গানের শুরুতে রাগের উল্লেখ আছে। পদকর্তাদের নাম- লুইপাদ, কুক্কুরীপাদ, বিরুবাপাদ, গুণ্ডরীপাদ, চাটিল্লপাদ, ভুসুকপাদ, কাহ্নুপাদ, কামলিপাদ, ডোম্বীপাদ, শান্তিপাদ, মহীধরপাদ, বীণাপাদ, সরহপাদ, শবরপাদ, ভাদেপাদ, আর্যদেবপাদ, ঢেণ্ডণপাদ, দারিকপাদ, কঙ্কণপাদ, তাড়কপাদ,

জয়নন্দীপাদ, ধামপাদ এবং তন্ত্রীপাদ।পরবর্তীকালে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত আরও প্রায় শতাধিক চর্যা আবিষ্কার করেছিলেন।

কোন ভাষায় লেখা : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থ প্রকাশের সময় মনে করেছিলেন চারটি পুঁথিরই ভাষা প্রাচীন বাংলা। কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের পর এ নিয়ে বহু বিতর্কের সূত্রপাত হয়। চর্যার ভাষাকে রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন পূর্বী হিন্দই এবং ড. বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া অসমীয়া বলে দাবী করেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ODBL-এ ছন্দ, ধ্বনিতত্ব ও রূপতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিপন্ন করেন যে 'ডাকার্ণব' ও দোহাগুলির ভাষা পশ্চিমা শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং চর্যার ভাষা প্রাচীন বাংলা। আসলে ওড়িয়া, বাংলা ও অসমীয়া একই মূল পূর্ব প্রান্তীয় কথ্য ভাষা থেকে উদ্ভূত সে কারণে অনেকক্ষেত্রেই এই তিন ভাষার মধ্যে সাধারণ উপাদান পাওয়া যায়। যার থেকে এই বিতর্কের সূত্রপাত। সুকুমার সেন পরবর্তীকালে বিচার করে দেখান, যেহেতু বাংলা ভাষার বিশিষ্ট কিছু লক্ষণ অন্য ভাষার তুলনায় চর্যায় বেশি সেহেতু সঙ্গত কারণেই চর্যার ভাষাকে বাংলা বলা সঠিক।

সন্ধ্যা ভাষা : হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন, চর্যাগুলি সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। টীকায় 'সন্ধ্যা' শব্দটি পাওয়া গিয়েছে। তার থেকে শাস্ত্রী মশাই নির্ধারণ করেছিলেন সন্ধ্যা ভাষার অর্থ আলো-আঁধারি ভাষা, কিছু বোঝা যায় কিছু বোঝা যায় না। অন্যদিকে বিধুশেখর শাত্রী 'সন্ধ্যা' শব্দটির বানান ও ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে আপত্তি প্রকাশ করে বলেন যে 'সন্ধ্যা' বানাটি লিপিকর প্রমাদ। প্রকৃত বানানটি হবে 'সন্ধা'। সম্-পূর্বক-ধা ধাতু থেকে এই শব্দের উৎপত্তি। এই ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী 'সন্ধা ভাষা'-র অর্থ যে ভাষা বা শব্দে সম্যকরূপে অর্থ নিহিত আছে। অর্থাৎ অভিপ্রায়িক অর্থ বা ভাষা। চর্যাগীতির আরেক বিশেষজ্ঞ প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছেন।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত অবশ্য 'সন্ধ্যাভাষা' সম্পর্কে আলোচনাকালে বলেন, হয়তো গোড়ায় শব্দটি 'সন্ধা' হিসেবেই ব্যবহৃত হতো পরে চর্যার ভাষার অস্ফূট প্রকৃতির জন্য 'সন্ধা' শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে 'সন্ধ্যা' হয়েছিল। বানান বা ব্যুৎপত্তি যাই হোক না কেন আমাদের দেশে প্রাচীনকালে ধর্মচর্যার গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ঋগবেদ বা অথর্ববেদেও সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার দেখা গিয়েছে। মনে রাখতে হবে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধন পদ্ধতি ও তত্ব পৃথিবীর মরমিয়া (mystic) সাধন পদ্ধতি সমূহের অন্যতম এবং তন্ত্রের নিয়মানুযায়ী সাধনার গোপনীয়তা রক্ষার কারণেই এগুলি সর্বজনবোধ্য ভাষায় লেখা হয়নি।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন 'সন্ধ্যা ভাষা' আসলে কোনও স্বতন্ত্র ভাষার নাম নয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধ যোগীদের সাধন পদ্ধতী গুহ্য বা গুপ্ত ব্যাপার। সাধনার গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্যই তাঁরা সাংকেতিক বা অভিপ্রায়িক ভাষায় পদগুলি রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে কিছু সংকেত বা code আছে। ফলত চর্যার পদগুলির একটি বাহ্যিক মানে এবং আরেকটি অভিপ্রায়িক অর্থ আছে। ধর্মতত্ব ও সাধনতত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন নির্দেশ দান উপলক্ষেই গানগুলি লেখা কিন্তু এই কিন্তু এই উপদেশ সর্বজনবোধ্য ভাষায় দেওয়া হয়নি। উদাহরণ: গঙ্গাজউনা> গঙ্গাযমুনা নদী> ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী। দুলি>কচ্ছপ> মহাসুখকমল। হরিণা>হরিণ>চিত্ত, ইত্যাদি ইত্যাদি।

পদ না গীতি : চর্যার গাঙ্গুলিকে বৈষ্ণব পদের ধারায় শাস্ত্রীমশাই পদ বলে উল্লেখ করেছিলেন, যে কারণে তিনি অনেক সময় এগুলিকে বৌদ্ধকীর্তন বা বৌদ্ধসংকীর্তন নামেও উল্লেখ করেছেন। চর্যাপদ নামতী তাঁরই সৃষ্টি। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে গঠনগত সাদৃশ্য থাকলেও এবং টিকাকার couplet-কে পদ বলে উল্লেখ করলেও, সে যুগে 'পদ' এবং 'গীত' বলতে আলাদা জিনিস বোঝাতো। সেজন্য এগুলিকে চর্যাপদ না বলে চর্যাগীতি বলাই শ্রেয়। তাছাড়া এগুলি উল্লেখের ক্ষেত্রে কোথাওই পদ শব্দটি ব্যবহার হয়নি বরঞ্চ দোহাগীতি, বজ্রগীতি, উপদেশগীতি-বলে উল্লিখিত হয়েছে।

কোন সময়ে লেখা : চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল নির্ণয়ে কিছু অসুবিধে আছে।হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী তাঁর আবিষ্কৃত পুঁথিগুলিকে মূল পুঁথি হিসেবে ধরে এগুলিকে হাজার বছরের পুরনো বলে বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে গবেষণায় প্রমাণিত হয় পুঁথিগুলি অনুলিপি ও টীকা এবং গায়ক ও লেখকদের মুখে মুখে বা অনুলিপির সময়

বেশ কিছু পরিবর্তন ও পাঠভেদ ঘটেছে।তাই রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন ও মহম্মদ শহীদুল্লাহ গানগুলিকে ৮০০ থেকে ১২০০ শতাব্দীর মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে চর্যাগানের রচনাকাল ১০ম থেকে ১২শ শতাব্দী। চর্যার আদিকবি লুই ছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সমসাময়িক। তাঁরা দুজনে 'অভিসময়বিভঙ্গ' নামে একটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দীপঙ্কর ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫৮ বছর বয়সে তিব্বতে যান। এই তথ্যের ভিত্তিতে সুনীতিকুমার সিদ্ধান্ত করেন, 'The literary life of Lui when he composed these songs can be very well be placed in the second half of the 10th. Century....This period provisionally may be regarded as the upper limit for the Caryas.' (ODBL)

অন্যদিকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে শ্রীকৃষ্ণপাদের লেখা একটা পুঁথি আছে। এই পুঁথির লিপিকাল আনুমানিক ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। সেদিক থেকে দেখতে গেলেও চর্যার রচনাকাল দশম শতকের পরবর্তীকালে বলে ধরা যায়। এছাড়া ভাষার লক্ষণ বিচার করে সুনীতিবাবু ১২০০ শতাব্দীকে চর্যার নিম্নসীমা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং জানিয়েছেন, 'The period 950-1200AD would thus seem to be a reasonable date to give to these poems, and they are presented in a post 14th. Century M.S.'

তবে তারাপদ মুখোপাধ্যায় ও কিছু গবেষক চর্যার লিপি ও পুঁথির ভিত্তিতে এগুলিকে দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে স্থাপন করেছেন।

নামকরণ: আবিষ্কৃত পুঁথিতে চর্যা-পদাবলির যে নাম পাওয়া যায় সেটি হল 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে এই নামটিই ব্যবহার করেছেন, সংক্ষেপে এটি 'বৌদ্ধগান ও দোহা' বা 'চর্যাপদ' নামেও অভিহিত হয়ে থাকে।[৬] কিন্তু আবিষ্কৃত পুঁথিটি যেহেতু মূল পুঁথি নয়, মূল পুঁথির নকলমাত্র এবং মূল পুঁথিটি (তিব্বতি পুঁথি) যেহেতু এপর্যন্ত অনাবিষ্কৃত, সেই কারণে পরবর্তীকালে চর্যা-পদাবলির প্রকৃত নাম নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।
মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে চর্যার প্রথম পদের সংস্কৃত টীকাটি (শ্রীলূয়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতেঽপ্যাশ্চর্যচর্যাচয়ে। সদ্বর্ত্মাবগমায় নির্ম্মল গিরাং টীকাং বিধাস্যে স্ফুটনম।।) উদ্ধৃত করে শ্লোকাংশের 'আশ্চর্যচর্যাচয়' কথাটিকে গ্রন্থনাম হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব রাখেন। তাঁর মতে, 'আশ্চর্যচর্যাচয়' কথাটিই নেপালী পুঁথি নকলকারীর ভুলবশত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' হয়েছে। তবে এই মতের যথার্থতা বিষয়ে আচার্য অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেহ প্রকাশ করেন।[৭] প্রবোধচন্দ্র বাগচী ওই একই সূত্র ধরে চর্যা-পুঁথির নাম 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আচার্য অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত খণ্ডন করে লিখেছেন, '"আশ্চর্যচর্যাচয়' নামটিও অযুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' ও 'আশ্চর্যচর্যাচয়', দুই নামকে মিলিয়ে 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' নামটি গ্রহণ করা যায় না। কারণ এই 'জোড়কলম' শব্দটি আধুনিক পণ্ডিতজনের পরিকল্পিত।"
আধুনিক গবেষকগণ তেঙ্গুর গ্রন্থমালা (*Bastan-hgyar*) থেকে অনুমান করেন মূল পুঁথিটির নাম ছিল *চর্যাগীতিকোষ* এবং তার সংস্কৃত টীকাটি 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' — অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই মত গ্রহণ করেছেন।[৫]

উৎসাহী পাঠকদের জন্য:

চর্যাগীতি পরিক্রমা : নির্মল দাশ

চর্যা পদসংকলন

- *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা*, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩২৩
- *চর্যাগীতি পদাবলী*, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫